ধর্ম পরিচয় বনাম মানবিক অধিকার রক্ষা*

ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু

... ধর্মকে ভিত্তিমূলে রেখে, ধর্ম ও ঈশ্বরকে শক্তি হিসেবে গ্রহন করে কোন লড়াই-ই প্রকৃত লড়াই নয়, তা এক বড় শত্রুকে উপেক্ষা করে ছোট ছোট অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মপ্রবঞ্চনাকারী সংগ্রাম মাত্র। জীবানুর আক্রমনে জ্বর হলে জীবানু মারার ব্যবস্হা না করে শুধু জ্বর কমানোর ঔষধ খাওয়ার মত। ...

কাউকে যদি জিগ্যেস করা হয় ' আপনি হিন্দু না মুসলমান?' তবে অবধারিত প্রায় সবাই উত্তর দিবেন '' হিন্দু অথবা মুসলমান '' (কিংবা খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ ইত্যাদি)। এমন কি নানা ধরনের প্রগতিশীল জনমুখী ক্রিয়াকান্ড ও সংগঠনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ও আচমকা এ প্রশ্ন করা হলে- নেহাৎ বিরল দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া- উত্তর একিই রকম পাওয়া যাবে। এ ধরনের প্রশ্ন শুধু যে সরাসরি মুখোমুখি আসতে পারে তা নয়; স্কুল-কলেজের ফর্ম , চাকরির আবেদন পত্র, বিয়ের সম্বন্দ, পাসপোর্ট করা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই আসা সম্ভব। সেখানে ও দু চারজন হয়তো অনিচ্ছা সত্তেও বাধ্য হয়ে জন্মসুত্রে পাওয়া ধর্ম পরিচয় লেখেন। বাকি সবাই স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম পরিচয় উল্লেখ করেন। এঁদের কাছে আপন ধর্ম পরিচয় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-খাওয়া-দাওয়া-ঘুমের মতই স্বাভাবিক ব্যাপার। আজন্ম এভাবেই তারা জেনে এসেছেন। নিজেকে হিন্দু-মুসলমান না ভেবে শুধু ' মানুষ ' হিসেবে ভাবার লোক খুব কম। প্রশ্নের উত্তরে '' আমি হিন্দু বা মুসলমান কিছুই নয়, আমার একমাত্র পরিচয় আমি মানুষ'', দ্বিধাহীন ভাবে এমন উত্তর দেয়ার লোক একেবারে বিরল- অন্তত আমাদের দেশে। এই দিকটির কিছু সরলীকরন করলে বলা যায় মানবিক অধিকার রক্ষার উদ্যোগে যাঁদের অধিকার রক্ষার আকাঙ্খা করা হয়, তাঁরা প্রকৃতভাবে নিজেদের মানুষ বলেই মনে করেন না;- অর্থাৎ এই প্রচেষ্টায় মানুষের চেয়ে কিছু ধর্মীয় ব্যক্তির ই স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয়। বর্তমান পরিস্তিতে তা হতে ও বাধা, কারণ প্রকৃত মানুষের চেয়ে ধর্মীয় মানুষ ই সংখ্যাগরিষ্ট, মনুষ্যত্বকে 'ধর্ম' বলে গ্রহন করেন এমন ব্যক্তির চেয়ে কৃত্তিম ও মিথ্যা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মকে 'ধর্ম ' বলে বিশ্বাস এমন মানুষদেরই রাজত্ব চলছে চারপাশে।

এ ব্যাপারে এখন কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর ও অলৌকিক শক্তি বাস্তবে অস্তিত্বহীন, তার অস্তিত্ব মানুষের কল্পলোকে। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নয়, বরং ঈশ্বরই মানুষের কল্পনার সন্তান। এখন থেকে প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানষ আধুনিক মানষে রুপান্তরের পর্যায়ে তার ক্রমউন্নতশীল মস্তিষ্কের ক্ষমতায় ঈশ্বর জাতীয় অতিপ্রাকৃতিক শক্তি ও মৃত্যু পরবর্তী প্রাণের তথা আত্মা জাতীয় কোন কিছুর কল্পনা করে। নিম্নতর কোন প্রাণির পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। এ কারণে গেরিলাশিম্পাঞ্জির মত মনুষ্যপ্রায় প্রাণীদের ও ভগবান জাতিয় কোনকিছু নেই বা এ ধরনের অস্তিত্বহীন কিছুকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্থহীন অনুষ্টান ও তারা করে না। মানুষ ই তার অনুসন্দিৎসা ও কল্পনার ক্ষমতায় অজ্ঞাতা ও অসহায়তার ফলে এ ধরনের অপত্তের সৃষ্টি করেছে। পর্বর্তী কালে- এখন থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে, শ্রেনীবিভক্ত সমাজ ধীরে ধীরে সৃষ্টি হওয়ার পর এসব তত্ত্ব আর শুধু কল্পনা হয়ে থাকে নি, তা বিশেষ শ্রেনীর হাতিয়ার ও হয়ে উঠেছে। শাষক শ্রেনী সেটিকে ব্যবহার করেছে শাষনের জন্য, নিজের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। শোষিত শ্রেনী ঐ কল্পনা ও বিশ্বাসের মধ্যে পেয়েছে তার ভরসার জায়গা, তাকে আকড়ে ধরেছে মানসিক শান্তি ও সুস্হির জন্য। ভারতীয় ভুখন্ডে একদিকে যাজ্ঞাবল্ক্য-এর মত পুরহিত শ্রেনীর মানুষ তৈরী করেছে জন্মান্তর ও কর্মফল জাতীয় সর্বনাশা তত্ত্ব, অন্যদিকে প্রবাহনের মত শাষকগোষ্টির প্রতিভূ জন্ম দিয়েছে ব্রম্মের মায়াময় বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব। পাশাপাশি শোষিত মানুষ তার দুর্দশার মূলে পূর্বজন্মের পাপ বা কর্মফল দায়ী ভেবে সান্ত্বনা

পেয়েছে এবং বিক্ষোভহীন নিষ্ক্রিয়তার ‘ শান্তি ’ উপভোগ করেছে, আর ব্রম্মজ্ঞান লাভের অন্তহীন প্রচেষ্টায় ঘুরে মরেছে। আখেরে নিশ্চিন্ত হয়েছে শাষকগোষ্টি। বিগত ৪-৫ হাজার বছর ধরে যে সব তথাকথিত ধর্মমতগুলি এই ধরনের বহুবিধ সর্বনাশা তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশেষ কিছু মানুষ তৈরী করেছে, তাদের মধ্যে সাময়িক কিছু সংশোধনবাদী বা বৈপ্লবিক ধ্যান ধারণা থাকলে ও একসময়তা কায়েমি শাষক গোষ্টির হাতের অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

এই অবস্তায় প্রচলিত এইসব ধর্মমতগুলিকে কোনভাবে প্রশ্রয় দেয়া প্রতক্ষ ও পরক্ষ- উভয়তই মানুষের, বিশেষত শোষিত মানুষের মানবিক অধিকারের পরিপন্থি। তা শুধু অস্তিত্বহীন ঐশ্বরিক শক্তির উপর নিস্ফল নির্ভরতার জড়াত্বকে কাটিয়ে নিজের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতেই মানুষকে বাধা দেয় না, তা শাষক শ্রেনীর অস্তিত্ব ও শাষনকে ও নিরাপত্তা দেয়, যে শাষক শ্রেনীই তার নেতৃত্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্তার মধ্য দিয়ে জনগণের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে ছলে বলে কৌশলে পদদলিত করেছে ও করে আসছে। তাই ঈশ্বরবিশ্বাস কেন্দ্রিক ধর্মগুলির বিরোধিতা করা এবং বিকল্প মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্টা করার মধ্য দিয়ে সেগুলিকে বিলুপ্ত করা মূলগত ভাবে শ্রেনীসংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশের প্রথমিক শর্ত। একই সঙ্গে তা আদর্শ ভাবে মানবিক অধিকার রক্ষা আন্দলনের ও সম্পৃক্ত দিক। ধর্মের মত একটি শক্তিশালী অস্ত্র শাষক শ্রেনীর হাতে সুরক্ষিত অবস্তায় রেখে তাদের দ্বারা নিপিষ্ট মানুষের অধিকার রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য;-অন্তত মূলগত ভাবে; ধর্ম আছে থাক , ধর্মে বিশ্বাস করার “ গণতান্ত্রিক অধিকার ” মানুষের থাকে থাকুক, আমি তার অন্য গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করি ও পাইয়ে দেই- এমন ইচ্ছা সৎ ও শুভ হলে ও তা চুড়ান্ত লক্ষে পৌঁছতে ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সর্বজনীন স্বাস্থ্য, খাদ্য বা শিক্ষা ইতাদ্যির অধিকার মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার ততটা দরকার নেই, যতটা দরকার তাকে এগুলি অর্জন করতে প্রস্তত করার। কিন্তু সে মানুষ যদি মনের গুপনে এটিই মনে করে যে এ সবে তার অপ্রাপ্তি তার নিজের কর্মফলের দোষ বা ঈশ্বরের অনভিপ্রায়প্রসুত কিংবা যদি এমনিই ভাবে যে এসব আবিষ্কার অর্জনের চেয়ে হিন্দু বা মুসলিম ইত্যাদি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা বেশি গুরুত্বপুর্ন (তাই বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা বা সলমান রুশদিকে মারা দরকার)- তবে সে আর যাই হোক বলিষ্টভাবে নিজের অধিকার অর্জন করানো মুস্কিল। ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস যে বিভ্রান্তি, নিষ্ক্রিয়তা, ক্লিবত্ব ও মেরুদন্ডহীনতার জন্ম দেয় তার দ্বারা আর যাই হোক বিশ্বাসীদের পরিপুর্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা মুস্কিল। ধর্ম বিশ্বাসী এমন মানুষকে শুভইচ্ছার সাহায্যে কেউ যদি কিছু পাইয়ে দেয় তবে তা সে পাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং তা তার পক্ষে স্হায়ীভাবে রক্ষা করা অসম্ভব।

এটি সত্য যে ইতিহাসের নানা সময়ে তথাকথিত ঐসব ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ সামাজিক আন্দোলন করেছেন, ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস তাদের শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বুঝা যাবে এ ধরনের কোন আন্দোলন ই অন্তত ঐ মনুষ্যগোষ্টিকে স্হায়ী ও পূর্ণ শোষন মুক্তির পথে পৌঁছে দেয় নি। আপাত কিছু সুবিধা ও সাময়িক কিছু সংশোধনীতে সন্তুষ্ট হয়ে সে ধর্মের বৃহত্তর গাডডায়, হয়তো আরও গভীর ভাবে প্রথিত হয়েছে। ধর্মকে ভিত্তিমূলে রেখে, ধর্ম ও ঈশ্বরকে শক্তি হিসেবে গ্রহন করে কোন লড়াই-ই প্রকৃত লড়াই নয়, তা এক বড় শত্রুকে উপেক্ষা করে ছোট ছোট অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মপ্রবঞ্চনাকারী সংগ্রাম মাত্র। জীবানুর আক্রমনে জ্বর হলে জীবানু মারার ব্যবস্হা না করে শুধু জ্বর কমানোর ঔষধ খাওয়ার মত।

>>>>>পরবর্তী পর্ব

অনুলিখন :
অনন্ত

(এই প্রবন্ধটি লেখকের “ অধার্মিকের ধর্ম-কথা“ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।)**